ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টন

মুফতী মুহাম্মাদ শফী

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টন

মুফতী মুহাম্মাদ শফী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ১২১

২য় সংস্করণ

রমযান	১৪১৮
পৌষ	১৪০৪
জানুয়ারী	১৯৯৮

বিনিময় ঃ ১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAMER DRISHTITE SHAMPOD BONTON by Mufti Mohammad Shafi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.
Phone : 23 51 91

Price : Taka 10.00 Only.

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে সম্পদ বন্টন একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কমূলক বিষয়। এই সম্পদ বন্টনই বিশ্বের বিপ্লবসমূহের জন্ম দিয়েছে এবং ইহা আন্তর্জাতিক রাজনীতি হতে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত প্রত্যেক কাজকে প্রভাবিত করেছে। এখন থেকে কয়েক শতাব্দী আগে ইহা শুধু উত্তেজনাময় একটা তর্কেরই বিষয় ছিল না, বরং এ থেকে সংঘর্ষেরও সূত্রপাত হতো। বস্তুত এ সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে যতো কিছুই বলা হোক না কেন, আল্লাহর প্রেরিত বাণী হতে এর সুষ্ঠু সমাধান গ্রহণ না করে কেবলমাত্র মানুষের বিচার শক্তির ওপর নির্ভর করে আমরা এক ধ্বংসাত্মক পথে নিয়ে চলেছি।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে 'সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন' পর্যায়ে কুরআন, সুন্নাহ এবং প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের ধারণা থেকে একটা সমাধান দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এ প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বা আলোকপাত সম্ভব নয়। সে জন্যে এ আলোচনাকে যতদূর সম্ভব প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বোধগম্য করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সম্পদের বন্টন সম্বন্ধে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্ তথা ইসলাম কি বলে এ বিষয়ে আলোচনার আগে ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি মৌলিক দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। এগুলোকে সম্পদ বন্টনের ইসলামী মতবাদের মৌলিক উপাদান বলে অভিহিত করা যেতে পারে এবং এমনিভাবে অনৈসলামিক অর্থনীতি বিষয় থেকে এগুলোকে পৃথক বা আলাদা করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক প্রশ্ন

এটা নিশ্চিত যে, ইসলাম বৈরাগ্য বা সন্যাসবাদী জীবনের ঘোর বিরোধী। কিন্তু ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে আইনসম্মত ও ন্যায্য জীবিকা মনে করে এবং সেজন্যে অনেক ক্ষেত্রে একে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। ইসলাম মনে করে যে, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি ছাড়াও মানুষের সঠিক এবং বিধিসম্মত জীবন যাপনের ব্যাপারে এর একটা বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তবে ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম বা আর্থিক উন্নতিকেই জীবনের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করে না।

www.pathagar.com

কোন ক্রিয়াকর্মকে বিধিসম্মত, প্রশংসনীয় এবং প্রয়োজনীয় মনে করা এক কথা, আর তাকে মনুষ্য জীবনের চিন্তা এবং কার্যের পরম বা চরম লক্ষ্য বলে ধরে নেয়া অন্য কথা—তা সাধারণ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন। আর এই দু' ভিন্ন দৃষ্টিভংগির সুস্পষ্ট দ্বন্দ্বের মাঝেই ইসলামী অর্থনীতি ও জড়বাদী অর্থনীতির মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে সে জন্যে প্রারম্ভেই এর একটা সুস্পষ্ট সমাধান বের করতে যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছি।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী অর্থনীতি এবং জড়বাদী অর্থনীতির মৌলিক এবং আসল পার্থক্য হচ্ছে ঃ জড়বাদী অর্থনীতির ক্ষেত্রে জীবিকা হলো মানুষের জীবনের প্রাথমিক সমস্যা এবং অর্থনৈতিক উন্নতিই এর চরম ও পরম পাওয়া। কিন্তু ইসলামের মতে, এই সমস্ত বিষয় প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য হতে পারে, কিন্তু মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না।

কুরআনে সন্যাসবাদের নিষেধাজ্ঞা এবং 'আল্লাহর বদান্যতা অনুসন্ধান করা'র নির্দেশ রয়েছে। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'আল্লাহর দান', অধিকারের ক্ষেত্রে 'সুন্দর সামগ্রী', 'আল্লাহ তোমার উপজীবিকার অবলম্বন', খাদ্যের ক্ষেত্রে 'সৎভাবে পবিত্র ও হালাল দ্রব্য', পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে 'আল্লাহর ভূষণ', বাসস্থানের ক্ষেত্রে 'বিশ্রামাগার', পার্থিব জীবনের বেলায় 'প্রলোভন ও প্রবঞ্চনা' কথাগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

কুরআনের এ বাচন-ভঙ্গির আসল রহস্য হলো ঃ সব উপজীবিকা ভ্রমণ পাথেয়। তার গন্তব্যস্থান হলো পরকাল। গন্তব্যস্থল লক্ষ্য করে চলা হলো চারিত্রিক মহত্ত্বের পরিচয় ও পরজগতে সুখী হওয়ার উপায়। এ লক্ষ্যে পৌঁছানো হলো মানুষের সত্যিকার সমস্যা ও তার জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য। কিন্তু দুনিয়ার পথের প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে তার সন্ধ্যান পাওয়া কঠিন। শুধু কি কঠিন? অসম্ভবও বটে। তাই তো যা তার পার্থিব জীবনে প্রয়োজন তা-ই অপরিহার্য। আখেরাত পেতে হবে দুনিয়াকে সাথে নিয়ে, দুনিয়াকে বাদ দিয়ে নয়। একথাটা জলন্তভাবে ফুটে উঠেছে কুরআনের এই আয়াতটুকুতে ঃ "আল্লাহ যা তোমায় দান করেছেন, তাই দিয়ে তুমি পরজগত অন্বেষণ করো।"

অন্যান্য অনেক আয়াতেও এর প্রতিধ্বনি রয়েছে। এই মর্মকথা অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে বলেই বহু অর্থনীতি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এরই মধ্যে খুঁজে পেতে পারি। মানবেতিহাসের এ ক্রান্তিলগ্নে বস্তুবাদী স্বার্থের বশবর্তী হয়ে

মানুষ যে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তার মর্মান্তিক দুর্দশার হাত থেকে একমাত্র রেহাই দিতে পারে ইসলামী অর্থনীতি।

সম্পদের প্রকৃতি

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে অন্য মৌলিক নীতিটি হলো ঃ সম্পদ ও তার সকল সম্ভাব্য উৎপন্ন সামগ্রী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো তাঁর মালিকানাভুক্ত। সম্পদ অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কেননা কুরআন দৃঢ় ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ "আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা হতে তোমরা তাদের প্রদান করো।"

এর ব্যাখ্যায় একথা বলা যায় যে, লোক শুধু তার শ্রম সম্পদোৎপাদনে নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ-ই সত্যিকারভাবে ইহা ফলপ্রদ ও উৎপাদনশীল করতে পারেন। ভূমিতে বীজ বোনা ছাড়া আর বেশী কিছু মানুষ করতে পারে না। কিন্তু বীজ হতে অঙ্কুর গজানো, অঙ্কুরকে গাছে পরিণত করানো মানুষের কাজ নয়, একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমরা যা কিছু বপন করো তা কি চিন্তা করো ? তোমরা কি নিজেরাই উদগত করো, না আমি উদ্গমকারী ?" অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ "তারা কি দেখে না যে, আমিই নিজের হাতে তাদের জন্যে গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি। তাইতো তারা উহাদের উপর সম্পদ-অধিকার লাভ করেছে।"

উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী এই মৌলিক মতবাদেই পৌঁছা যায় যে, সম্পদ সবসময়ই নীতিগতভাবে আল্লাহর এবং তিনিই ইহা মানুষকে দান করেছেন। বিধিপ্রদত্ত এই সম্পদ তাঁরই আদেশানুযায়ী ব্যয় করতে হবে।

একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ সম্পদ অধিকারে স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। প্রকৃত সম্পদদাতা আল্লাহ। সম্পদ ব্যয়ের খাত তিনিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশিত পথে তা খরচ করবো। এই কথাগুলো নিম্নোক্ত আয়াতটিতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ঃ

"আল্লাহ যা দান করেছেন, তা দিয়ে তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করো এবং দুনিয়ার অংশ নিতে তুমি শিথিলতা করো না। সৎকাজ করো। আল্লাহ তোমাদের সে জন্যেই পাঠিয়েছেন। لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ "পৃথিবীর বুকে ফেতনা-ফাসাদ ছড়িও না।" এই আয়াত ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ সম্বন্ধে সব প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব। যেমন ঃ

www.pathagar.com

ক. মানুষের দখলকৃত সকল সম্পত্তি বিধিপ্রদত্ত।

খ. ইহ জীবনের মাধ্যমে পারলৌকিক জীবনের জন্যে মানুষের সম্পদ ব্যবহার করা উচিত।

গ. আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় করা উচিত।

এই স্বর্গীয় আদেশের দু'টো দিক রয়েছে ঃ

এক ঃ আল্লাহ একে অপরকে সম্পদ দিতে আদেশ করতে পারেন। তাহলে ইহা অবশ্যই মানতে হবে। আল্লাহ তোমাদের সৎকাজের জন্যে পাঠিয়েছেন, তাই তিনি তোমাদের সৎকাজ করতে আদেশ দিতে পারেন। যেমন ঃ "সৎকাজ করো। আল্লাহ তোমাদের সে জন্যেই পাঠিয়েছেন।"

দুই ঃ তিনি নির্দিষ্ট কোন পথে সম্পদ ব্যয় করতে বলতে পারেন। কেননা, তিনিই নির্দেশনামার একমাত্র নির্দেশক। যেমন ঃ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ "পৃথিবীর বুকে ফেতনা-ফাসাদ ছড়িও না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১১)

'সম্পদের প্রশ্নে' পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও ইসলামের মধ্যে এ-ই পার্থক্য। পুঁজিবাদ তথা জড়বাদের নীতি মানুষকে তার সম্পদ সম্পর্কে শর্তহীন ও স্বতন্ত্র অধিকার দান করে এবং তার ইচ্ছানুযায়ী ইহা ব্যবহারের বিধি প্রদান করে। নবী হযরত শোয়াইব (আ)-এর উম্মাতের কথায় এর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে ঃ

"তোমার সালাত কি তোমাকে আদেশ করে যে, আমাদের পূর্বপুরুষের পূজা আমরা ছেড়ে দেবো আর আমাদের সম্পত্তি যথেচ্ছা ভোগ করা থেকে বিরত থাকব।"

এসব লোক তো তাদের সম্পত্তিকে সত্যি সত্যি 'আপন সম্পত্তি' বলে মনে করতো এবং 'যথেচ্ছা' ব্যবহারের দাবীই ছিলো তাদের প্রাণের একমাত্র দাবী। পবিত্র কুরআনের সূরায়ে নূরে 'আল্লাহর সম্পত্তি' কথা দ্বারা পুঁজিবাদীদের ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা হয়েছে। সাথে সাথে 'আল্লাহ যা তোমাদের দান করেছেন' কথা দ্বারা সমাজবাদীদের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। কেননা, সূরায়ে ইয়াসীনের ৭১নং আয়াতে "তারা কি বুঝে না যে, আমার হাত দিয়ে তাদের জন্যে যে সম্পদ আমি তৈরী করেছি, তারা তার মালিক।"—এই আয়াতে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে আল্লাহর দান বলা হয়েছে।

এখন আমরা ইসলাম, সমাজবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমা-রেখা টানতে চেষ্টা করবো। পুঁজিবাদ হলো ব্যক্তিগত মালিকানার একটা স্বতন্ত্র

www.pathagar.com

ও শর্তহীন অধিকার। সমাজবাদ হলো এর সম্পূর্ণ উল্টো আরেকটা দিক। ইসলাম হলো এ দুয়ের মাঝে সমান রেখা স্বরূপ। ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বকে স্বীকার করে, তবে একটা স্বতন্ত্র ও শর্তহীন অধিকার হিসেবে নয়।

মূল উদ্দেশ্য

যদি কুরআনের আলোকে আমরা সম্পদ বন্টন পদ্ধতি আলোচনা করি, তবে এর তিনটি উদ্দেশ্য আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠবে।

এক ঃ ব্যবহারোপযোগী অর্থনৈতিক বিধির প্রবর্তন

ইহা এমন একটি বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক ও বাস্তব অর্থনীতির পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদিকা, যা বিনা দ্বিধায় স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা ও প্রবণতা অনুযায়ী শ্রমের অনুমোদন দান করে। এতে তার নিশ্চিত ফল পাবার সুযোগ ষোলআনা। চাকুরিদাতা ও চাকুরের মধ্যে আন্তরিক হৃদ্যতা, সখ্যতা এবং যোগান ও চাহিদার উপকরণের মধ্যে সঠিক বোঝাপড়া ছাড়া এ ফল পাবার ষোলআনা কেন, এক আনার আশাও বাকী থাকে না। এ জন্যেই ইসলাম এসব উপাদানগুলো সমর্থন করে। এ মতবাদের সমর্থন আমরা পাক কুরআনে খুঁজে পাই। যেমন ঃ

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ-

"তারা কি তোমার প্রভুর রহমত বন্টন করে ? আমি তাদের মধ্যে পার্থিব জীবনে তাদের উপজীবিকা বন্টন করি। তাদের মধ্যে একজনকে আরেক জনের চাইতে উচ্চ সম্মান দান করি, যাতে করে একজন অপরজনকে অধীন করতে পারে। আর তোমরা যে অর্থ সংগ্রহ করো, তার চেয়ে তোমার প্রভুর রহমত অতি উত্তম।"-(সূরায়ে যুখরুফ ঃ ৩২)

দুই ঃ প্রাপকের নিকট তার স্বত্ব পৌছে দেয়া

প্রত্যেকেরই আপন আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করা উচিত। কিন্তু এ অধিকারের ইসলামী ধরন-ধারণ অন্যান্য অর্থনীতি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। বস্তুতান্ত্রিক অর্থনীতি পদ্ধতিতে সম্পদ অধিকারের একটি মাত্রই পথ আছে আর তাহলো সরাসরিভাবে উৎপাদনে অংশ নেয়া। অন্য কথায় শুধু ঐসব

www.pathagar.com

উপাদান যার দ্বারা সম্পদ উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে শরীক হওয়া যায়, সেগুলোর জন্যেই সম্পদের অংশ পাওয়া যাবে। অপরপক্ষে এই ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক পদ্ধতি হলো ঃ সম্পদ একমাত্র আল্লাহরই সম্পত্তি। তিনিই শুধু কিভাবে সম্পদ ব্যবহৃত হবে, তার নীতি নির্ধারণ করতে পারেন। যারা সম্পদ উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে, শুধু তারাই নয়, বরং যাদেরকে সাহায্য করা যাদের জন্যে বাধ্যতামূলক ও অপরিহার্য কর্তব্য করা হয়েছে, তারাও উহার বৈধ ও ন্যায্য অংশীদার। সুতরাং গরীব, দুঃখী, অসহায় ও অভাবগ্রস্ত—সবারই সম্পদে ন্যায্য অধিকার আছে। গরীব-দুঃখীদের মধ্যে সম্পদ বিতরণের বা ভাগ করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ উৎপাদকদের আদেশ করেছেন। এ আদেশ গরীবের প্রতি ধনীর সহানুভূতি নয়, বরং তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ হতে ফরয বা বাধ্যতামূলক কর্তব্য। আবার অন্য দিকে গরীবদেরও এটা হাত পেতে নিতে হবে না ; বরং এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। এ ব্যাপারে কুরআন বলে ঃ

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

"যে লোক প্রার্থী হয় এবং যার (সম্পদের) প্রয়োজন রয়েছে, ধনীদের সম্পদের উপর তাদের ন্যায্য অধিকার রয়েছে ..।"-(আয যারিয়াহ ঃ ১৯)

এ আয়াতে গরীবের অধিকারকে আল্লাহর অধিকার বলা হয়েছে। উৎপাদনে শরীক হওয়ার জন্যেই যে সম্পদের মালিকের তাতে অধিকার রয়েছে তাই নয়, বরং অভাবগ্রস্তদেরও তাতে ন্যায্য অধিকার রয়েছে। তাই ইসলামের দৃষ্টিকোণে যারা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করবে, তাদের অবদানের জন্যে পুরস্কার হিসেবে সম্পদ বন্টিত হবে, আবার আল্লাহ সম্পদে যাদের অধিকার ধার্য করেছেন, তাদের মধ্যেও সম্পদ বন্টিত হবে।

তিন ঃ সম্পদ এক কেন্দ্রীকরণের মূলোৎপাটন

সম্পদ সুদাশ্রয়ী পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত। মানবতার ইতিহাসে আমীর এবং ফকিরের মাঝে প্রকট পার্থক্য। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সবস্তরের মানুষের কাছে সম্পদ পৌছিয়ে দেয়া। তাহলে ধনী ও নির্ধনের মধ্যকার হিমালয় বরাবর তারতম্য থাকবে না। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ধরনের মৌলিক সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় বা কোন বিশেষ মহলের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে না এবং এগুলো অবশ্যই সবাই সমানাধিকারে ভোগ করতে পারবে ঃ

www.pathagar.com

১. খনিজ সম্পদ, ২. বনজ সম্পদ, ৩. মালিকানাহীন অনুর্বর ভূখণ্ড, ৪. শিকার ও মাছের জায়গা, ৫. চারণভূমি, ৬. নদী, ৭. সাগর, ৮. গনীমাতের মাল। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মানব সমাজ তিনটি জিনিসে সমান অংশীদার—ক. পানি, খ. ঘাস ও গ. আগুন। বিখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ নেহায়ার প্রণেতা আগুনের টীকায় লিখেছেন ঃ স্বয়ম্ভু বৃক্ষের জ্বালানী কাঠকেই আগুন বুঝানো হয়েছে। মালে গনীমাত সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন ঃ 'আল্লাহ জনপদসমূহের অধিবাসীগণ হতে রাসলূকে যা প্রত্যর্পণ করেছেন ; বস্তুত তা আল্লাহ, রাসূল, তাঁর আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, দীন-দরিদ্র ও পথিকদের জন্যে, যেন ইহা পর্যায়ক্রমে তোমাদের অন্তর্গত ধনীদের হস্তগত না হয়।'

প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মদক্ষতা ও শ্রম অনুসারে এগুলো ভোগ করতে পারে। দু' চার জন ভাগ্যবান ব্যক্তি গোটা সম্পদের মালিক নয়।

এছাড়া যদি কারো সম্পদোৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং কেউ যদি শ্রম করতে চান, তখন ইসলাম তাকে এই উপকরণ কাজে লাগাতে অনুমতি দেয় এবং সম্পদোৎপাদনে মালিকানা স্বত্বাধিকার দান করে। প্রত্যেক শ্রমিককে তার শ্রমানুসারে লভ্যাংশ দেয়া হয়। এ সম্পর্কে কুরআন বলে ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ط (الزخرف : ٣٢)

"আমি তাদের পার্থিব জীবনের যার যার জীবিকা বন্টন করেছি। তাদের মধ্যে একজনকে আরেকজনের চেয়ে উচ্চসম্মান দান করি।"

অর্থনীতি কাঠামো সুদৃঢ় করার মানসে এবং সার্বিক কল্যাণের জন্যে অনুরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, কতিপয় পুঁজিপতির হাতে তা কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্যে নয়।

সম্পদ বন্টনের উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যের ভেতর প্রথমটি ও তৃতীয়টিতে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ হতে ইসলামী অর্থনীতির পার্থক্য দেখানো হয়েছে ; আর দ্বিতীয়টিতে সমাজবাদ ও পুঁজিবাদ উভয়েরই বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। এই তিনটি মৌলিক নীতি আলোচনার পর আমরা কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী শাস্ত্রবিদদের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টনের পূর্ণ রূপরেখা আলোচনা করতে প্রয়াস পাবো।

www.pathagar.com

বিভিন্ন মতবাদ

ইসলামের দৃষ্টিকোণ দ্বারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে পুঁজিবাদীর দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টন পদ্ধতি ভালভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। এই ধারণা মোতাবেক যারা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে এবং যারা এর উপকরণ যোগায়, তাদের মধ্যেই সম্পদ বন্টিত হওয়া উচিত। তাদের মতে উৎপাদনের উপাদান হলো চারটি ঃ মূলধন, শ্রম, ভূমি ও সংগঠন। মূলধনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ উৎপাদনের উৎপাদিকা উপাদান। মূলধন বলতে প্রকৃতিপ্রদত্ত দ্রব্য ছাড়া সেইসব উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রী বুঝায়, যেগুলো মানুষ পরিশ্রম প্রয়োগ করে সৃষ্টি করেছে। শ্রম বলতে বস্তুগত লাভের আশায় উদ্যোগ বুঝায়। ভূমির সংজ্ঞায় প্রাকৃতিক সম্পদ বুঝানো হয়েছে। সংগঠন এমন একটি উপাদান, যা তিনটি উপাদানের সংহতিতে পূর্ণ হয় এবং উৎপাদনের লাভ ও ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করে।

পুঁজিবাদী মতে, চারটি উপাদানের সহযোগিতায় উৎপাদিত সম্পদ এভাবে বন্টিত হবে ঃ

সুদ হিসেবে মূলধন একাংশ পাবে। পারিশ্রমিক হিসেবে শ্রম আরেক অংশ পাবে। রাজস্ব বা খাজনা হিসেবে ভূমি পাবে একভাগ এবং লাভ হিসেবে সংগঠন পাবে আরেক ভাগ।

সমাজতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গী

অন্যদিকে সমাজতন্ত্রীর মতে, মূলধন ও ভূমি জাতীয় বা সামগ্রিক সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং সুদ এবং ট্যাক্স বা ভূমি রাজস্বের আদৌ কোন প্রশ্নই উঠে না। এই পদ্ধতিতে সংগঠনও কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতে নয়, বরং সরকারই স্বয়ং সংগঠক। অন্ততপক্ষে এই মতানুযায়ী মুনাফার তো কোন কথাই উঠে না। এখন উৎপাদনের শুধু একটা দিক বাকী আছে আর তাহলো শ্রম। শ্রমই শুধু সম্পদের অধিকারী বলে বিবেচিত হয়, যা সে পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করে।

ইসলামী মতবাদ

ইসলামের সম্পদ বন্টন পদ্ধতি অপর দু'টি মতবাদ হতে একেবারে আলাদা। ইসলামের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, দু' শ্রেণীর লোক সম্পদের অধিকারী। তারা হলো ঃ

www.pathagar.com

এক ঃ যাদের প্রাথমিক অধিকার আছে অর্থাৎ যারা উৎপাদনের ক্রমোন্নতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।

দুই ঃ যাদের গৌণ অধিকার আছে অর্থাৎ যারা উৎপাদনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে না, বরং তারা সম্পদের সহ অংশীদার। যেহেতু তাদের উৎপাদক হিসেবে গণ্য করা হয়।

এবার আমরা এ দু' শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করতে চেষ্টা করবো।

উপরের ব্যবস্থা অনুযায়ী সম্পদের প্রথম পর্যায়ের অধিকারী উৎপাদনের উপাদানই উপভোগ করবে। কিন্তু এ উপাদানগুলোর ব্যাপারে না বিশেষ কোন নির্দেশ অথবা বাস্তব সংজ্ঞা আছে, না অর্থনীতির পুঁজিবাদ পদ্ধতি অনুসারে তাদের অংশ নির্ধারিত হয়েছে। আসলে ইসলামের পদ্ধতি দু'টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইসলামের দৃষ্টিতে উৎপাদনের তিনটি মাত্র উপকরণ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. মূলধন ঃ মূলধন উৎপাদনের সেই উৎপাদিকা, যা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না যদি না ইহা পূর্ণভাবে ভোগ করা হয় অথবা ইহার বিকল্প গ্রহণ করা হয়। তাই বলে এটা ভাড়া বা ইজারা হতে পারে না। যেমন, তরল মুদ্রা বা খাদ্যোৎপাদন ইত্যাদি।

২. ভূমি ঃ উৎপাদকের উৎপাদিকায় ভূমি এভাবে ব্যবহৃত হয় যে, ইহার মৌলিক ও বাহ্যিক রূপ অপরিবর্তিত থাকে এবং ইহা ভাড়া বা ইজারা দেয়া যেতে পারে। যেমন, ভূমি, বাড়ী-ঘর, কলকজা ইত্যাদি।

৩. শ্রম ঃ ইহা দৈহিক বুদ্ধিমত্তা বা আন্তরিক সংগঠনের একটি মানবিক উদ্যম বা দৃঢ় পদক্ষেপ। এই উদ্যম সংগঠন ও পরিকল্পনাকেও সংযোজন করে। এ তিনটি উপাদানের সংহতিতে সম্পদ উৎপন্ন হয় বলেই ইহা এ তিনটি উপাদানের মধ্যে মুখ্যত বন্টিত হতে হবে। লাভ হিসেবে মূলধনের একাংশ রাজস্ব ও পারিশ্রমিক হিসেবে ভূমি ও শ্রমের অন্যান্য অংশ থাকবে।

ইসলাম ও সমাজতন্ত্র

ইসলাম ও সমাজতন্ত্র[১] দু'টি আলাদা জীবন দর্শন। সমাজতন্ত্র একটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ। বিখ্যাত লেখক জোয়াডের মতে Socialism in short

১. এখানে সমাজবাদী অর্থব্যবস্থার মূল দর্শনের উপর আলোচনা হচ্ছে। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কার্যধারার উপর নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বর্তমান কার্যক্রম সাম্যবাদের মূল থিউরী হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

is like a hat that has lost its shap because every body wears it—'সমাজতন্ত্র একটা সাহেবী টুপী স্বরূপ যার নির্দিষ্ট কোন আকার নেই ; কারণ বিভিন্ন প্রকারের মস্তক বিশিষ্ট সকল ব্যক্তি তা পরিধান করে।' সমাজতন্ত্রের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। তবে বড় বড় পণ্ডিতগণ কোন ঐকমত্যে না পৌছলেও মোটামুটিভাবে বলা চলে, উৎপাদনের উপকরণ, যথা—ভূমি ও পুঁজি রাষ্ট্রের করায়ত্ত করার নাম সমাজতন্ত্র। ইসলামী অর্থনীতিও একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট দর্শন। এ দুয়ের অর্থনৈতিক কাঠামো ও পদ্ধতিতে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ দু'টিই পরস্পর সংঘাতপূর্ণ দর্শন। ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বে সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী নয়, সেহেতু শ্রমের মানানুসারে ইহা সম্পদ বন্টন করে। অপর পক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে সকল সম্পদের মালিকানা স্বত্ব একমাত্র আল্লাহরই। কুরআন ইরশাদ করে ঃ "আল্লাহ ছাড়া অপর কারো মালিকানা স্বত্ব নেই।" মৌলিক সম্পত্তিতে সকলেরই সমান অধিকার রয়েছে, যেমন—অগ্নি, পানি, ভূমি, আলো, বাতাস, চারণভূমি, শিকার ও মাছের জায়গা, খনিজ দ্রব্য, মালিকানাহীন অনাবাদি ভূমিসমূহ ইত্যাদি।

আবার ব্যক্তিগত মালিকানাও ইসলাম সমর্থন করে। কারো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোন জিনিস কেড়ে নেয়া যাবে না এবং তা অপরের ধনাগারের সম্পদ বাড়াবে না। সমাজতন্ত্র কায়েম হলে দেশের সকল মূলধন ও ভূমি-সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, তাহলে অসংখ্য ও অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিপতি দেউলিয়া হয়ে যাবে, আর জাতীয় সম্পদের সকল উৎস একমাত্র বড় পুঁজিপতি রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হবে। এতে করে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী সরকারে পরিণত হতে পারে। তাই সমাজতন্ত্র হলো সম্পদ একত্রীকরণের নিকৃষ্টতম পদ্ধতি। ইহা সকল মানব সমাজের বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও কর্মদক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা সুস্থ মানসিকতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরম ও চরম শত্রু। মোদ্দাকথা, সমাজতন্ত্র হলো ইসলামের তিনটি বন্টন নীতির দু'টির নাঙ্গা তলোয়ার।

এগুলো হলো সমাজবাদের সহজাত ত্রুটি। ইসলাম কোন দিনই ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তক্ষেপ করে না। কেননা, কুরআন পাক বলে ঃ

১. "হে মু'মিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অবৈধভাবে আত্মসাৎ করো না। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে খুশীমত ব্যবসার ভেতর দিয়ে তা ভোগ করা যাবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৯)

২. "তোমাদের ধন-সম্পত্তির সাথে তাদের ধন-সম্পত্তি ভোগ করো না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২)

www.pathagar.com

৩. "যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তারা অগ্নি ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করে না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১০)

৪. "তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন আত্মসাৎ করো না আর উহা বিচারকের কাছে এ জন্য উপস্থাপিত করো না যাতে তোমরা জ্ঞাতসারে লোকের ধনের অংশ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে পারো।"

হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ খবরদার ! কোন মুসলমানের মাল তার অনুমতি ছাড়া হালাল হতে পারে না।

ইসলাম সমাজবাদের মত পারিশ্রমিক হিসেবে সম্পদ বন্টন করে না। তবে তার দৃষ্টিতে মুনাফা ও রাজস্ব বিবেচিত হয় এবং সুদ প্রথা নিষিদ্ধ হয়। সম্পদ পঞ্জীভূতকরণও ইসলাম অনুমোদন করে না। আর এটা হলো পুঁজিবাদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর একে দূরীকরণের দাবী সমাজতন্ত্র করে থাকে।

ইসলাম ও পুঁজিবাদ

ইসলাম ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে, নীচে তার তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হলো ঃ

এক ঃ ইসলামের মতে সংগঠনকে উৎপাদনের নিয়মিত উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। তাই এর তিনটি উপাদান অনুমোদিত হয়েছে। এর দ্বারা সংগঠনের অস্তিত্ব বিলোপ বুঝানো হচ্ছে না। তবে ইহা একটি আলাদা উপাদানও নয়। ইহা তিনটির যে কোন একটির সাথে জড়িত।

দুই ঃ ইহা মূলধনের পুরস্কার হিসেবে অনুমোদিত মুনাফা, সুদ নহে।

তিন ঃ উৎপাদনের উপাদানসমূহের বিভিন্ন সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। পুঁজিবাদের মতে মূলধনের সংজ্ঞা হলো ঃ উৎপাদকের উৎপাদিকা।

সম্পদ বন্টন নীতির ইসলামী মতবাদে মূলধনের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তাহলো ঃ উৎপাদনের উৎপাদিকা, যা উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, যদি না ইহা পূর্ণভাবে ভোগ করা হয় অথবা ইহার বিকল্প গ্রহণ করা হয়। তাই বলেই ইহা ভাড়া বা ইজারা হতে পারে না। যেমন মুদ্রা। এই সংজ্ঞানুযায়ী কলকজা মূলধনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

চার ঃ এ একই উপায়ে ভূমিরও ব্যাপক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। বলতে গেলে যেসব জিনিস বা প্রাকৃতিক সম্পদ এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার ভোক্তা পূর্ণ ভোগ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কলকজাও এ শ্রেণীর শামিল।

www.pathagar.com

পাঁচ ঃ শ্রমের এমন ব্যাপক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যে, মানসিক শ্রম ও পরিকল্পনা এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার। পুঁজিবাদীর মতে, সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা হলো ঃ ইহা ব্যবসায়ের ঝুঁকি গ্রহণ করে। অর্থাৎ লাভ ও ক্ষতির দায়িত্ব বহন করে। এ দিক দিয়ে মুনাফা হলো ব্যবসায়ের অজানিত সঙ্কটে অসম সাহসিকতার পুরস্কার। কেননা, একমাত্র মুনাফাই সম্ভাব্য সকল ক্ষতির ভার বা ঝুঁকি বহন করে। অপর তিনটি উপাদান লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করে না। মূলধন, ভূমি ও শ্রম চুক্তি অনুসারে যথাক্রমে সুদ, খাজনা ও পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। অন্যদিকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলধনই সম্ভাব্য সকল ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করে ; অন্যান্য উপাদানগুলো নয়। এ ঝুঁকি অন্য কারো ঘাড়ে চাপান যেতে পারে না। যে ব্যক্তিই ব্যবসায়ে নিজের পুঁজি লাগাতে ইচ্ছা করবে, তাকেই ঝুঁকি বহন করতে হবে। তাই পুঁজিপতিই উক্ত ঝুঁকি গ্রহণকারী হিসেবে মালিক। আর মালিকই পুঁজিপতি। অতএব পুঁজিপতি লাভ-ক্ষতির মাঝে দ্বিবিধ সম্ভাবনার মাঝে দোদুল্যমান।

নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে মূলধনের বিনিয়োগ করতে পারে। যথা ঃ

ক. ব্যক্তিগত ব্যবসা ঃ একই ব্যক্তি ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করবে। অন্য কোন অংশীদার ব্যতিরেকে সে নিজেই উহা পরিচালনা করবে। এমতাবস্থায়, সে যা লাভ করবে, তাকে মুনাফা বলা যেতে পারে। কিন্তু অর্থনীতির সংজ্ঞানুসারে মূলধন ও শ্রম খাটানোর জন্যে এটা হবে মুনাফা ও পারিশ্রমিক।

খ. অংশীদারী ব্যবসা ঃ মূলধন বিনিয়োগের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো ঃ কয়েকজন মিলে মূলধন বিনিয়োগ করবে, একত্রে ব্যবসা চালাবে এবং একত্রে উহার লাভ বা ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করবে। ফিকাহর পরিভাষায় একে 'শিরকাতুল উকুদ' বা 'চুক্তিবদ্ধ অংশীদারী ব্যবসা' বলা হয়। অর্থনীতির সংজ্ঞানুযায়ী সকল অংশীদার মূলধন বিনিয়োগের জন্যে মুনাফা পাবে এবং তারা ব্যবসা পরিচালনার জন্যে পারিশ্রমিকও লাভ করবে। ইসলাম এ পদ্ধতিকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছে। প্রাক ইসলামী যুগেও এ প্রচলন ছিলো। তাই বিশ্বনবী (সা) ইহা বহাল রেখেছেন। ফুকাহাও ঐক্যবদ্ধভাবে এর বৈধতার রায় যুগিয়েছেন।
–(মাবসুত ঃ ১১শ খণ্ড)

www.pathagar.com

গ. মূলধন ও সংগঠন সমবায় ঃ এটা হলো, কেউ মূলধন নিয়োগ করবে, কেউ ব্যবসা পরিচালনা করবে। এদের প্রত্যেকেই মুনাফা বা লভ্যাংশ পাবে। ফিকাহ্র পরিভাষায় একে বলা হয় 'মুযারাবাত'। অর্থনীতির পরিভাষায়, মূলধন বিনিয়োগকারী বা রব্বুলমাল মুনাফা হিসেবে তার অংশগ্রহণ করবে। আর ব্যবসা পরিচালক পারিশ্রমিক হিসেবে তার লাভের অংশগ্রহণ করবে। হ্যাঁ, যদি মুযারিব বা পরিচালক তার ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তার শ্রম বিফল হবে। তেমনি বিনিয়োগকারীর মূলধনেরও ক্ষতি হবে। এরূপ ব্যবসাও ইসলাম অনুমোদিত। মহানবী (সা) বিয়ের আগে হযরত খাদিজা (রা)-এর সাথে এমনি চুক্তিতে ব্যবসা করেছিলেন (জুরকানী)। মুসলিম ফিকাহবিদদের সকলেই উপরোক্ত পদ্ধতিতে একমত হয়েছেন। এ তিনটি পদ্ধতি ছাড়া ইসলাম অন্য কোন উপায়ে মূলধন খাটানো অনুমোদন করে না।

সুদে টাকা খাটানো

অনৈসলামিক সমাজে আরেকটি মূলধন খাটানোর পদ্ধতি রয়েছে। সেটা হলো ঃ সুদে টাকা খাটানো। অর্থাৎ একজন ঋণ হিসেবে মূলধন ধার দেয়, আর একজন এটা শ্রমে খাটায়। যদি এতে কোন লোকসান হয়, তবে যে লোক টাকা নিয়ে খাটালো, তারই লোকসান হলো, মূলধন ওয়ালার নয়। কিন্তু যে কোন অবস্থায়ই সুদটা মূলধনওয়ালার প্রাপ্য। লাভ ক্ষতি উভয় অবস্থায়ই সুদ তাকে যোগাতে হবে। ইসলাম এ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং যদি সত্যিকার বিশ্বাসী হও, তবে সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট রয়েছে তা বর্জন করো। কিন্তু যদি বর্জন না করো, তবে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধ বিঘোষিত হচ্ছে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৮)

পবিত্র কুরআন এরপর আরো বলে ঃ

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝

"যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের আসল মূলধন রয়েছে। তোমরা অত্যাচার করো না আর অত্যাচারীতও হয়ো না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৯)

এ দু'টো আয়াতের 'সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট রয়েছে' ও 'তোমাদের মূলধন রয়েছে' কথা দু'টো দ্বারা এ-ই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তায়ালা সামান্যতম সুদেরও প্রশ্রয় দেননি। 'সুদ বর্জন করো' দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগকারী শুধু তার মূলধন ফেরত পাবে। ইসলাম সব ধরনের সুদই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। প্রাগৈসলামিক যুগে এক গোত্র অপর গোত্র হতে সুদে মুদ্রা বা মূলধন এনে বাণিজ্য করতো ইসলামের আবির্ভাবের পর ইহা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ "ইসলাম পূর্ব যুগে বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের লোক বনুল মুগীরাদের নিকট হতে সুদ গ্রহণ করতো এবং এরা তাদেরকে সুদ দিতো। মরুভাস্কর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শুভাগমনে এরা তাদেরকে একটা উপযুক্ত মানের টাকা পরিশোধ করলো।"

উপরের ইতিহাসের মর্মানুযায়ী ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আরব দেশের প্রতিটি গোত্রের পরস্পরে যৌথ কারবার (Joint Company) ছিলো। গোত্রের সভ্যদের যৌথ মূলধন (Joint Capital) দ্বারা ইহা গঠিত হতো। গোত্রের সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে অপর গোত্রের নিকট হতে টাকা গ্রহণ করলেও ইহা বাণিজ্য হিসেবে পরিগণিত হতো। পবিত্র কুরআন ইহাও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলামের অর্থনীতি মতে, যদি কোন লোক কোন ব্যবসায়ীকে বিনিয়োগের জন্যে টাকা দিতে চায়, তবে আগেই তাকে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে যে, সে ঐ টাকার লভ্যাংশ গ্রহণ করবে, না এমনিই টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। যদি সে ঐ টাকার লভ্যাংশ গ্রহণ করতে চায়, তবে সে অংশীবাদী ব্যবসা অথবা সমবায় ব্যবসায়ের নীতি গ্রহণ করবে। এরূপ ক্ষেত্রে তাকে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে। মুনাফা বা ক্ষতিতে তাকে শরীক হতে হবে। হাঁ, যদি সে এমনিই টাকা দিয়ে সাহায্য করে, তবে তাকে মুনাফা ছেড়ে দিতে হবে এবং যতো টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করেছে, তা সে ফেরত নিতে পারবে। ইসলাম এটা এ জন্যেই সঙ্গত বলেছে যে, নির্দিষ্ট সুদ হলে ক্ষতির বেলায় সম্পূর্ণ ক্ষতির ভারটা ঋণীর ওপরই বর্তাবে।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদদের মতে, ঝুঁকি নেয়া হলো সংগঠনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। ইসলাম ঝুঁকি নেয়াকে মূলধনের বৈশিষ্ট্য বলে দাবী করে। সংগঠন ও

www.pathagar.com

মূলধন একক বা অভিন্ন। তাই মুনাফা সংগঠনেরই প্রাপ্য। সুদ এর প্রাপ্য নয়। আবার কোন কোন অর্থনীতিবিদের মতে পরিচালনা ও পরিকল্পনা সংগঠনের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। তাহলে আমাদের মতে ইহা শ্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। সংগঠনকে আলাদা উপাদান মনে করা হলে তা হবে অপ্রয়োজনীয় বাড়তি।

কেরায়া ও সুদের পার্থক্য

ইসলাম মুনাফা ও মজুরীকে আইনসঙ্গত এবং সুদকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। পূর্বেই ইহার পর্যাপ্ত আলোচনা হয়েছে। এখন আমরা চতুর্থ দফা ভূমি রাজস্ব বা খাজনা সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করবো। ইসলামের দৃষ্টিতে খাজনা আইনসঙ্গত বলে স্বীকৃত হয়েছে। তবে এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ মূলধনের সুদ দেয়া-নেয়া অবৈধ হলে ভূমির রাজস্ব দেয়া-নেয়া সঙ্গত হবে কেন ? কেননা উভয় উপাদানেই নির্দিষ্ট হার রয়েছে।

এ প্রশ্নের জবাবের আগে আমাদের অর্থনীতি ক্ষেত্রে দু' প্রকার সম্পদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে হবে। প্রথমে এমন কতকগুলো সামগ্রী রয়েছে, যা ব্যবহার করার পরও তার উপাদান অক্ষয় থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ভোগ করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ ভূমি, কলকব্জা, আসবাবপত্র ও গাড়ীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, এমন কতকগুলো প্রয়োগযোগ্য পণ্য দ্রব্য আছে, যাহা কিছু দিয়ে গ্রহণ করতে হয়। অথচ ইহার কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। উহা ব্যবহারের জন্যে মজুরী বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ইহাই ইসলামী পরিভাষায় রাজস্ব নামে পরিচিত। প্রথমটির সাথে শেষেরটির তুলনা করে বুঝা যাবে যে, মুদ্রা প্রয়োগযোগ্য। ইহা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা যায়। এর প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় না, যদি না এর পরিবর্তন গ্রহণ করা হয়। ঋণদাতা টাকা দিয়ে লাভের আশায় শ্রম নিয়োগ করে। এতে মুদ্রার মান কমে না। মুদ্রার মালিকের দু'টো দিকের স্বাধীন চিন্তাধারা রয়েছে। হয়তো টাকা সে আদৌ ধার দেবে না, নয়তো অংশীদারী বা সমবায় ব্যবসা করবে। হাঁ, যদি সে টাকা ধার দেবার মনস্থ করে, তাহলে ইসলামী মতে নির্ধারিত কোন সুদে সে ধার দিতে পারবে না। এ সংজ্ঞানুযায়ী ঃ পুরো ভোগ ব্যতিরেকে যে সামগ্রী ব্যবহারোপযোগী নয়, তা-ই মূলধন। এগুলো উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি দিয়ে পরিমাপ করলে মুনাফা হয়। পুরো ভোগ ব্যতিরেকে যে সামগ্রী ব্যবহারোপযোগী হয়, তা-ই ভূমি। আর ইহা উৎপাদনে অংশ নেয় বলেই প্রদানযোগ্য আংশিক সম্পদকে খাজনা বা ভূমি রাজস্ব বলে।

www.pathagar.com

সুদ অবৈধকরণের প্রভাব

ধন বন্টনের দিক দিয়ে ইসলাম ও পুঁজিবাদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট। তাহলো ঃ ইসলাম সুদ সমর্থন করে না। কিন্তু পুঁজিবাদ তা করে। এ সমস্যার অন্য কতকগুলো দিক আছে। যেমন প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ সুদ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কি ? আসলে সম্পদোৎপাদন পদ্ধতির দিক দিয়ে সুদ নিষিদ্ধকরণ একটা উপকারী এবং সুদুরপ্রসারী ফলপ্রসু ব্যবস্থা। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। তাই আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু ঐ সব প্রতিক্রিয়ার দিকে অর্থবহ ইঙ্গিত করে যেতে চাই যা ধন-সম্পদ বন্টন প্রক্রিয়াকে প্রভাবান্বিত করে।

সুদ নিষিদ্ধকরণের সবচেয়ে বড়, সহজ ও নির্ভেজাল ফল হলো ঃ ইহা এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে সমতা ও সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করে। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হলো ঃ উপাদানের একটি অংশ মানে মূলধনের জন্যে নির্ধারিত মুনাফা ধার্য করা। অপরপক্ষে, অন্য অংশ মানে মুনাফা অনিশ্চিত ও শঙ্কামূলক থাকে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমের মজুরীর কোন নিশ্চয়তা নেই। সাধারণত যখন বড় বড় ব্যবসায়ের ঝুঁকি উৎপাদনের উৎপাদিকার অপর্যাপ্ততার দরুন পর্যাপ্ত সীমানায় নেমে আসে, তখন বাহ্যিক উপাদানের দরুন তারা হয় খোদাই করা যন্ত্র স্বরূপ। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ধন বন্টনের সমতা অত্যন্ত সচল, অস্থিতিশীল টলটলায়মান। মাঝে মাঝে ঋণী বা খাতক সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথচ ঋণদাতা বা মহাজন অনেক টাকা লাভ করে। আবার মাঝে মাঝে সংগঠন বহু মুনাফা লাভ করে, অথচ মূলধন বিনিয়োগকারী ইহার সামান্য অংশই লাভ করে থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুদ অবৈধ বা হারাম, তাই শুধু দু'টো পদ্ধতিতেই মূলধন খাটানো যায়—(ক) অংশীদারী ব্যবসায় (খ) সমবায় ব্যবসায়। ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে এ দু'টো প্রণালীই অসমতামুক্ত। ব্যবসায়ে লোকসান হলে দু'জনকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে এবং লাভ হলে দু'জনেই তা সমানুপাতে ভাগ করে নেবে। মূলধন খাটানোর এ পদ্ধতি হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিষ্টকর সম্পদ সমাহরণের পরিপন্থী এতে ধন-সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে সমাজ-জীবনের প্রতিটি সভ্যের কাছে এমনভাবে বন্টন হয়ে যায়, যাতে কারো ওপর অবিচার ও অত্যাচার করা না হয়। পুঁজিবাদের মতে, পুঁজিবাদী জাতীয় সম্পদের শুধু বিরাট অংশই নয়, বরং গোটা বাজারের নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও স্বীয় সুদে বড় আস্থাবান। ফলত

www.pathagar.com

সরবরাহ ও মূল্য পদ্ধতি প্রাকৃতিক অবস্থায় কাজ করতে সক্ষম নয়। এগুলো পরিবর্তনশীল বলে মানবিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করে।

সুদ নিয়ন্ত্রণ করে ইসলাম এ কুকর্মের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে। ইসলামের মতে, কেহ মূলধন নিয়োগ করলে লাভ বা ক্ষতির অংশ তাকে বহন করতে হয় এবং এর গুরুদায়িত্বও মাথায় তুলে নিতে হয়। তাকে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছাচারী আচরণ করতে দেয়া হয় না।

একক মত বিনিময়

সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির অপকারের উল্লেখ করতে গিয়ে আমরা বলেছি যে, ধনোৎপাদনে সুদ অসমতার সৃষ্টি করে এবং মূলধন ও শ্রমের একটি বা অপরটির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কেহ কেহ সুদভিত্তিক অর্থনীতির ক্ষতিটা বিচার-বুদ্ধি ও বুদ্ধিমত্তার ওপর চাপিয়ে দেয়। তারা বলে : যদি কেহ স্বতস্ফূর্তভাবেই এ ধরনের ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহলে শরীয়াতের বিধি-ব্যবস্থা তাদের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করবে কেন ?

একটা সামান্য উপমার সাহায্যে এ সমস্যার আশু ও সহজ সমাধান হতে পারে। ইসলামের মতে, মূলধন ও শ্রমের 'পরস্পর মত বিনিময়' সবসময়ই নিশ্চিত সম্পাদন বা চুক্তি হতে পারে না। যেমন, যদি কেহ বলে যে, 'আমাকে কেহ খুন করলে আমি রাজী আছি।' একথার পর তাকে কেউ খুন করলে খুনী তার অপরাধ হতে রেহাই পেতে পারে না। ঠিক তেমনি অপরিণামদর্শিতার স্বাক্ষর হিসেবে পাশ্চাত্য দেশসমূহে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও পরস্পর একক মত বিনিময়ের দোহাই দিয়ে অপরাধী নির্দোষ হতে পারে না। ধন বন্টনের প্রশ্ন হলো আরো দুরূহ ও জটিল। আগেই কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারা সব ধনই আল্লাহর মালিকানাভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ যা মানুষকে দান করেছেন, তা নীতিসাপেক্ষ। তা শর্তহীন ও লাগাম ছাড়াভাবে ব্যয়িত হবার জন্যে নয়। তাই ইসলাম পরস্পর একক মত বিনিময় অনুমোদন করে না। কেননা, পরস্পর একক মত বিনিময় বা মালিক ও শ্রমিকের মত বিনিময়ে পুঁজিবাদের বিরাট পাহাড় গড়ে ওঠে। এ জন্যেই শহরে পৌছার আগে গ্রাম হতে আগত বণিকদের শস্য কেনা, দুর্ভিক্ষের দিনে গ্রাম হতে আগত মধ্যবিত্ত লোকের সামগ্রী খরিদ করা, শস্যশীষ, কর্তনোপযোগী শস্য ও গাছের ফল তোলা, ফলের বিনিময় করা এবং ইজারার জমির কর্তনোপযোগী শস্যের

www.pathagar.com

নির্ধারিত মূল্য লওয়া হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। এসব চুক্তি ও ছোলেহ বিচারের মাপকাঠিতে টেকে না—ফানুসের মতো উড়ে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুদের অবৈধতার ওপর প্রশ্নের বান ডেকেছিলো। তারা বলেছিলো ঃ "ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা-বাণিজ্য) সুদের অনুরূপ।" কুরআন এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে এবং বলেছে ঃ وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا "আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ ব্যবসা ও সুদের হালাল-হারামের কোন নীতি বা উদ্দেশ্য ঘোষণা করেননি। বরং সরাসরি বাণিজ্য বৈধ ও সুদ অবৈধ বলে নির্দেশ জারী করেছেন। তাই এ ফরমানে ইলাহী মেনে নেয়া প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অকল্যাণ ও সমাজবাদের প্রকৃতি বিরোধী নৃশংসতার হাত থেকে রেহাই পাবার ইহা একমাত্র সুষ্ঠু সমাধান। একমাত্র ইহাই চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও কঠিন দাসত্বের হাত থেকে আধুনিক বিশ্বকে বাঁচাতে পারে। হুকুমে ইলাহী সুবিচার ও নিরপেক্ষতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ফ্রান্সের প্রাচ্যভাষাবিদ লুস ম্যাসিন্টনের উক্তিটি এ ক্ষেত্রে সত্যিই প্রণিধানযোগ্য ঃ

"ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংঘাতের সুরাহা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি একমাত্র সেই সংস্কৃতিই (ইসলাম) দিতে পারে, যা শুধু সুদই নিষিদ্ধ করেনি, বরং সুদে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অভিশপ্ত মানবতাকে এর করাল গ্রাস থেকে নিরাপত্তার পথ বাতলিয়ে দিয়েছে।"–(ইসলাম কী মায়াশী নযরিয়ে ঃ ২ খণ্ড, পৃঃ ৪২৮)

মজুরী সমস্যা

ইসলাম ও ধনতন্ত্রের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য 'সুদ' সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পেশ করার পর চাকুরীদাতা (মালিক) ও চাকুরের (শ্রমিক) মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো। এ আলোচনার আগে 'মজুরী সমস্যা' আলোচনা করার চেষ্টা করছি ঃ

চলতি দুনিয়ায় ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রধান অস্ত্র হলো মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার সাংঘাতিক সংঘাত ও মজুরী নির্ধারণ সমস্যা। যেহেতু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি স্বার্থপর নীতি ও ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে, সেহেতু মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সরবরাহ ও চাহিদার সম্পর্ক যান্ত্রিক, কর্কশ ও বাহ্যাড়ম্বর হয়ে গেছে। মালিকেরা শ্রমিকদের ওপর এ জন্যে

www.pathagar.com

সামান্য সহানুভূতিশীল হয়, যেহেতু তারা তাদের ব্যবসায় সুদের অভিলাষী। হাঁ, যদি তাদের সুদ পাবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে তারা শ্রমিকদের প্রতি মারমুখী হয়। অপর দিকে, শ্রমিকেরা জীবিকা নির্বাহের জন্যেই আদেশ পালন করে। তবে যখন তার স্বাধীনতা খর্ব হয়, তখন সে কাজ বন্ধ করে দেয়, তারপর ধর্মঘটে নেমে পড়ে। এ দ্বিমুখী সংঘাতই উভয়ের সদ্ভাব ভেঙ্গে দেয়। এর বদৌলতেই তারা শোচনীয় পরিণতিতে উপনীত হয়।

অপর পক্ষে, ইসলাম মালিক ও শ্রমিকের সরবরাহ ও চাহিদা ব্যবস্থা স্বীকার করে বটে, কিন্তু যান্ত্রিক সম্পর্ক হিসেবে নয়—ভ্রাতৃ সম্পর্ক হিসেবে। এ সম্পর্কের একটা নির্ভেজাল নির্যাস ও সংক্ষিপ্ত উদাহরণ কুরআনে দেখতে পাই। হযরত শোয়াইব (আ) তাঁর চাকর হযরম মূসা (আ)-এর সাথে এমনভাবে কথোপকথন করেন ঃ "আমি আপনার ওপর (অযথা) শ্রমের বোঝা চাপাতে পসন্দ করি না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে শীগগীরই একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে দেখতে পাবেন।"

এ আয়াত দ্বারা ইহাই বুঝা যায়, মুসলমান মালিকের জীবনের লক্ষ্য হলো পুণ্যবান হওয়া। সে তার চাকরের ওপর অপ্রয়োজনীয় বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) একথাই অন্যভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

هُمْ اَخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اَخَاءُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلِيُلْبِسْ مِمَّا يَلْبِسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يُغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يُغْلِبُهُ فَلْيُعِيْهُ عَلَيْهِ ـ(بخارى كتاب الايمان)

"তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের চাকর। তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের তাবেদার করে দিয়েছেন। সুতরাং যে লোকের ভাই তার অধীন, সে লোকের উচিত, সে যা আহার করে তা তার ভাইকে যেনো আহার করায়, সে যা পরে, তা তার ভাইকে যেনো পরায় এবং তাদের ওপর ক্লান্তিকর কোন বোঝা চাপিয়ে দিও না। যদি তোমরা তাদের ওপর এমনি কোন বোঝা চাপিয়ে দাও, তবে তোমরাও তাদের সাহায্য করো।"–(বুখারী)

অন্য হাদীসে তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

"শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগে তার মজুরী আদায় করো।" (ইবনে মাজা ও তাবরানী) মহানবী (সা) আরও বলেন ঃ তিন প্রকার এমন মানুষ আছে যারা

www.pathagar.com

বিচারের দিনে আমাকে দুশমন মনে করবে। তাদের একজন হলো, "যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে মজুরীর চুক্তিতে খাটিয়েছে এবং সম্পূর্ণ কাজ আদায় করে নিয়েছে ; অথচ মজুরের মজুরী আদায় করেনি।"–(বুখারী) শ্রমিকের অধিকার সম্বন্ধে মহানবী (সা) যে কতো উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তা হযরত আলী (রা)-এর সংগৃহীত ও সংরক্ষিত একটি হাদীস হতে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন ঃ মহানবী (সা)-এর মহাপ্রয়াণের প্রাক্কালে তাঁর সর্বশেষ বাণী ছিলো এই ঃ "দৈনন্দিন সালাতের প্রতি লক্ষ্য রেখো এবং তোমাদের অধীনদের হক আদায় করো।"–(ইবনে মাজা)

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা ভ্রাতৃসম ও সম্মানের পাত্র। মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসে এর অগণিত নযীর বিদ্যমান রয়েছে। এ পদ্ধতির চেয়ে শ্রমিকদের নিশ্চিত অধিকার আদায়ের কোন উত্তম ব্যবস্থাই সম্ভব নয়।

ইসলাম শুধু মালিকদের কর্তব্যের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সাথে সাথে শ্রমিকদেরও কর্তব্য বাতলে দিয়েছে। তাকে সর্বান্তকরণে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র জীবিকা নির্বাহের জন্যেই এ দায়িত্ব সে পালন করবে না, বরং তার সামনে যে বাস্তব ও বিকল্প লক্ষ্যবস্তু আরেক পৃথিবী রয়েছে, তার সুখ-শান্তির জন্যেই এ দায়িত্ব পালন করবে। এ সম্পর্কে কুরআন বলে ঃ হে বিশ্বাসীগণ ! তোমাদের চুক্তি পূরণ করো।"

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ "উত্তম শ্রমিক সে-ই, যে শক্তিশালী ও সত্যবাদীও বটে।"–(সূরা আল কাসাস ঃ ২৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝ (المطففين : ١-٣)

"ধ্বংস হীন ঠকবাজদের জন্য। তারা অন্যদের কাছ থেকে ঠিক মতো মেপে আনে, কিন্তু নিজেরা মাপে কম দিয়ে প্রবঞ্চনা করে।"

ইসলামী শাস্ত্রবিদদের মতে উপরোক্ত আয়াত শ্রমিকদের বেলায়ও প্রযোজ্য। কাজ করার চুক্তি করে প্রবঞ্চনা করা গুনাহে কবীরা (গুরুতর পাপ)। যখন কোন শ্রমিক মালিকের কোন কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তখন তাকে যথাসাধ্য ঐ কাজ ন্যায়পরায়ণতা ও সততার সাথে সমাধা করতে হবে। নতুবা পারলৌকিক জীবনে চিরন্তন সুখ হতে সে বঞ্চিত হবে।

www.pathagar.com

সরবরাহ ও চাহিদা

সরবরাহ ও চাহিদার পদ্ধতি মেনে নেয়া হয়েছে বলে ইসলাম মালিক শ্রমিক উভয়ের জন্যেই কতকগুলো নির্দেশ প্রবর্তন করেছে। সরবরাহ ও চাহিদা পদ্ধতি মানবিক সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বের নিয়ামক হতে হবে ; নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তা নয়। কেহ হয়তো মনে করতে পারে যে, এ ব্যাপারে ইসলামী নির্দেশ শুধু নৈতিক উৎকর্ষই সাধন করে, অর্থনীতির দিক দিয়ে এর তেমন কোন মূল্য নেই। কিন্তু যারা ইসলামের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য জানে না, তারা এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম শুধু অর্থনীতির পদ্ধতির নামই নয়। ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইহা মানবিক কর্ম পরিবেশে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তিগতভাবে এর একটি গণ্ডির বিবেচনা করার চেষ্টা করলে অনেকগুলো গণ্ডিতেই ভুল বুঝাবুঝি হবে। যখন এগুলোকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে জরিপ করা হবে, তখনই এগুলোর সত্যিকার রূপ ফুটে উঠবে, আপন অভিব্যক্তিতে বাঙময় হয়ে উঠবে। ইসলামী অর্থনীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নৈতিক শিক্ষাকে বাদ দেয়া সম্ভব হবে না।

ইসলাম একটি বৈশিষ্টময় মতবাদ। যদি কেহ উদার দৃষ্টি নিয়ে এর বৈশিষ্টগুলো বিচার করে, তাহলে এসব নৈতিক শিক্ষাও আইন সংগত বলে মনে হবে। পর জগতের পুরস্কার বা তিরস্কার নৈতিকতার ওপর চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে। এ পুরস্কার বা তিরস্কার মুসলমানদের জীবনের মুখ্য লক্ষ্য। পরকালে বিশ্বাস শুধু নৈতিক চরিত্রেরই মূলধন নয়, বরং সকল আইনেরই চাবিকাঠি। কুরআনের ভিত্তিতে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারি যে, সবসময়ই আল্লাহভীরু ও পরকালে বিশ্বাসী লোককে লক্ষ্য করে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। পরকালের বিশ্বাস মনে দানা না বাঁধলে কেউ কাউকে জোর করে নৈতিক চরিত্রের কথা শোনাতে পারে না। তথাকথিত আধুনিক সভ্য দেশে যে হারে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে, তা যান্ত্রিক সভ্যতা রোধ করতে পারছে না। পরকালের বিশ্বাসই এর একমাত্র প্রতিকার। ইসলাম এরই ওপর জোর দিয়েছে। মালিক-শ্রমিকের সম্পর্কও নৈতিক চরিত্রের মাপকাঠিতে উন্নত হতে পারে। পার্থিব সুখে বিভোর প্রগতিবাদীরা সৃষ্টির রহস্য হারিয়ে ফেলেছে।

আজকের মানসিকতা—যা শুধু পার্থিব সমস্যার প্যাঁচে জর্জরিত হয়ে জড়বাদী চেতনার বাইরের কোন কিছু চিন্তা করার অনুভূতিটুকু হারিয়ে ফেলেছে, তা নৈতিকতাকে জলাঞ্জলী দিয়েছে। তার জন্যে এ সত্যটিকে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা মুসকিল হলেও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে,

www.pathagar.com

শান্তি ও নিরাপত্তা যদি আজকের মানবতার ভাগ্যে থেকে থাকে তবে তাকে হাজার হোচট খেয়ে অবশেষে ঐ মৌলিক সত্যটির দিকেই ফিরে আসতে হবে, যার দিকে পবিত্র কুরআন বার বার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে। মানুষকে যদি শান্তিময় জীবনের স্বাদ পেতে হয়, তবে তাকে ঘুরে ফিরে কুরআনের সত্যেই অবশেষে ফিরে আসতে হবে।

যখন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিলো তখনকার পৃথিবী কুরআনে করীমের ঐ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতা খুব ভালো করেই যাচাই করেছে, জরিপ করেছে তার অণু-পরামাণু। তখনকার ইতিহাসে আজকের শ্রমিক মালিকের প্রাণান্তকর সংগ্রামের একটি নযীরও পাওয়া যাবে না, হাজার চেষ্টা চরিত্র করেও নয়। সে দিনের সে নীতি বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থাকেই একেবারে ওলট-পালট করে দিয়েছিলো। কুরআন ও সুন্নাহর এ নৈতিক নিদর্শনাবলীই এ ঘোরতর ও জটিল সমস্যার একটা আশানুরূপ নিরাপদ সমাধান বাতলে দিয়েছিলো। এর ফলে ইসলামের প্রথম শতাব্দীর ইতিহাস আলোচ্য বিশ্বের অত্যাচার, অনাচার, জোর-জবরদস্তি ও হরতালমুক্ত ঘোলাটে পরিস্থিতি হতে একেবারে মুক্ত—কলুষহীন।

অপ্রধান খাতসমূহ

এতোক্ষণ আমাদের আলোচনা চলেছে সম্পদ বন্টনের প্রাথমিক পর্যায়ের অধিকারীদের সম্পর্কে। ইসলামের অর্থ বন্টন ব্যবস্থার একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট এই যে, সমাজের দুর্বল শ্রেণীদেরকে শক্তিশালী ও বেকারকে কর্মক্ষম করে তোলার জন্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের (অপ্রধান) হকদারদের এক বিরাট তালিকা উৎপাদনকারীদের অর্জিত সম্পদে অংশীদার হিসেবে ইসলাম পেশ করেছে। সাথে সাথে এর একটি আইনানুগ পদ্ধতিও কায়েম করেছে।

এ নিবন্ধের প্রথম দিকেই এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছিলাম যে, সমস্ত সম্পদ মূলত আল্লাহর মালিকানাভুক্ত। তিনিই এ সবের স্রষ্টা আর তিনিই একমাত্র অনুগ্রহ করে এর মধ্যে মানুষকে দিয়েছেন মালিকানা স্বত্ব। মানুষ তার মেহনত ও শ্রম ব্যয় করে যা কিছু পায়, তারই সে মালিক। কিন্তু রোজগার ও অর্জনের ক্ষমতা আল্লাহই দিয়ে থাকেন। আবার সম্পদ তিনিই তৈরী করেন। তাই তো মানুষকে তার মালিকানা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বল্গাহারা, লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। যেখানে সেখানে, বিপথে ব্যয় করার অধিকার তার নেই, বরং সে আল্লাহর দেয়া বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত। কারণ আল্লাহ তাকে যেসব খাতে এগুলো খরচ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেসব খাতে সে খরচ করতে বাধ্য।

www.pathagar.com

এ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন কাজে অংশ নেয়া ছাড়াই সম্পদ পাবার অন্য খাতও এমনিই বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে আরও অনেকে ধন-সম্পদের হকদার বলে বিবেচিত হয়। তাই এদের কাছে সম্পদ পৌঁছিয়ে দেয়ার গুরুদায়িত্ব প্রাথমিক পর্যায়ের মালিকদের ওপর সোপর্দ করা হয়েছে। এমনি করেই সম্পদ বন্টনের দ্বিতীয় স্তরের হকদারদের একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরী হয়ে যায়, যাদের প্রত্যেকেই সম্পূর্ণভাবে সম্পদের মালিক।

এসব খাত নির্ধারণ করে ইসলাম সম্পদকে সমাজের প্রতিটি স্তরে ব্যাপক হারে আবর্তিত করেছে। সুদকে হারাম ঘোষণা করে সম্পদ এককেন্দ্রীকরণের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপিত হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ এ নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে সম্ভব নয়, তবুও সংক্ষেপে গুটিকয়েক কথার ভিতর দিয়ে তা পেশ করতে চেষ্টা করবো ঃ

এক ঃ যাকাত

দ্বিতীয় স্তরের খাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক ও বড় খাত হলো যাকাত। কুরআন মজীদের অনেক জায়গায় এর ফরয হওয়ার কথা ও অপরিহার্যতার বাণী সালাতের পাশাপাশি আলোচনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সোনা, রূপা, গবাদি পশু এবং ব্যবসায়ের মালে নিছাবের মালিক হয় অর্থাৎ একটা বিশেষ পরিমাণ—যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়, ততটুকু মালের অধিকারী ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্য তাকে পূর্ণ এক বছরের মালিক হতে হবে। তাকে তার মালিকানাধীন সম্পদ হতে বিশেষ একটা অংশ অভাবগ্রস্তদের মধ্যে দান করে দিতে হবে। এ হলো কুরআনের নির্দেশ। এ নির্দেশ যারা অমান্য করবে বা কর্তব্য আদায়ে যারা গড়িমসি করবে, তাদের সম্পর্কে কুরআনের হুঁশিয়ারি এসেছে। কুরআন বলে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○ (التوبه : ٣٤ـ ٣٥)

"যারা স্বর্ণ, রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না। তাদের তুমি বেদনাদায়ক শাস্তির কথা জানিয়ে দাও যেদিন এসব

www.pathagar.com

সম্পদকে জাহান্নামের অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হবে, অতপর এ দিয়ে তাদের কপালে, পাশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে (আর বলা হবে) এ সম্পদ তোমরা জমা করে রেখেছিলে, তাই জমাকৃত, তার স্বাদ এবার ভোগ করো।"

যাকাত ব্যয় করার আটটি খাত বা জায়গা আল্লাহ নিজেই কুরআনে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন মজীদে একমাত্র যাকাতের উক্ত আটটি ব্যয়ের স্থল বা খাত নির্ধারণ করে দিয়ে সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে সম্পদ ঘূর্ণনের দুয়ার খুলে দিয়েছে। 'মাছরাফ' বা ব্যয়ের জায়গাগুলোর মধ্যে যাকাত লাভের সাধারণ যোগ্যতা হলো অভাব ও দারিদ্র। কেউ অভাবের অবস্থায় যাকাত লাভ করতে পারবেই, আর কোন ক্ষেত্রে হোক বা না হোক। যাকাতের খাতে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য যথেষ্ট জোর দেয়া হয়েছে। এভাবে অভাবী ও গরীবদের মধ্যে কতটুকু ব্যাপকতার সাথে সম্পদ বন্টন করা সম্ভব, তার কিছুটা অনুমান নিচের আলোচনা থেকে স্পষ্ট ফুটে ওঠে ঃ

১৯৬৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় আয় ছিল পনরশো ত্রিশ কোটি টাকা। এ জাতীয় আয় হতে যদি যাকাতের নিম্নতম হার হিসেবে শতকরা আড়াই টাকা অনুযায়ী যাকাত বের করা হয়, তবে বছরে কমপক্ষে আটত্রিশ কোটি পঁচিশ লাখ টাকা সমাজের দরিদ্র ও গরীব দুস্থদের মধ্যে বন্টিত হতে পারে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, সমগ্র উৎপাদনকারী যদি প্রতি বছর ন্যায়ভাবে, বিশ্বস্ততার সাথে যাকাত দিয়ে দেয়, তবে বার্ষিক কতো বিরাট অঙ্কের অংশ পুঁজিপতিদের পকেট থেকে বের হয়ে গরীব-দুস্থ-অনাথদের হাতে পৌছে যেতে পারে। আর এমনিভাবে বর্তমান সম্পদ বন্টন ব্যবস্থার ভারসাম্যহীন বৈষম্য কতো তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যেতে পারে।

দুই ঃ উশর

জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর দেয় যাকাতকে আসলে উশর বলে। কিন্তু এর উৎপাদনে মানুষের শ্রম তুলনামূলকভাবে কম ব্যয় হয়, তাই এতে শতকরা আড়াই টাকার পরিবর্তে শতকরা দশ ভাগ ধার্য করা হয়েছে। কেবল মাত্র ঐসব জমিতেই উশর দেয়া ওয়াজিব হয়, যেসব জমি শরীয়াতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'উশরী'। ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় উশরী জমি বলতে বুঝায় বিজয়ী মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর যুদ্ধলব্ধ ভূমি, আরবের জমি, নওমুসলিমের কৃষি বা চাষাবাদের উপযোগী ভূমি এবং উত্তরাধিকারহীন যিম্মীদের যেসব সম্পত্তি মুসলমানদের দখলে এসেছে সেসব সম্পত্তি।

www.pathagar.com

তিন ঃ কাফ্ফারা

সমাজের লাখো-কোটি মানুষের হাতে ধন-সম্পদ পৌঁছে দেয়ার এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র পন্থা ইসলাম আবিষ্কার করেছে। তাহলো 'কাফ্ফারা'।

কোন কারণ ব্যতিরেকে, ওজর ছাড়া কেউ ইচ্ছা করে পবিত্র রমযান মাসের রোযা ভেঙ্গে ফেললে বা কোন মুসলমানকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে কিংবা স্বীয় স্ত্রীর সাথে 'জেহার' অর্থাৎ যাদেরকে বিয়ে করা শরীয়াত অনুযায়ী হারাম, তাদের বিশেষ অঙ্গের সাথে স্ত্রীকে তুলনা করলে, অথবা কসম বা শপথ করার পর তা রক্ষা করতে না পারলে আপন মালের কিছু অংশ গরীব-মিসকীনদেরকে দান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ কোন কোন সময় ফরয হয়, আবার কখনো কখনো ফরয হয় না। এ কাফ্ফারা নগদ টাকা হিসেবে বা খোরাকী হিসেবেও আদায় করা যেতে পারে।

চার ঃ সাদকায়ে ফিত্র

উপরোল্লিখিতগুলো ছাড়াও যারা নেসাবের মালিক, ঈদুল ফিতরের সময় তাদের উপর আরেকটা দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। সেটা হলো ঃ জনপ্রতি এক সের বার ছটাক গম বা এর মূল্যের টাকা ঈদের নামাযের পূর্বেই অভাবী, গরীব, ইয়াতীম ও বিধবাদের দান করে দেয়া। এ সদকা শুধু নিজের তরফ থেকে দিলেই হবে না, বরং নিজের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের তরফ থেকেও আদায় করতে হবে। ফিতরার মালের জন্যে এক বছর একজনের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া এর জন্যে অতিরিক্ত অর্থ থাকারও কোন প্রয়োজন নেই। এতে বুঝা যায়, এ ফরযটি যাকাত থেকেও ব্যাপকতর। কেননা সাদকায়ে ফিতরের মাধ্যমে জাতীয় আনন্দ-উল্লাসের সময়টিতে বেশী করে আর্থিক সমতা আনা সম্ভবপর। অন্য সময় তেমনটা সম্ভব নয়।

উপরের চারটি খাত গরীব, মিসকীন, ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীনদের মধ্যে ধন-সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে। এছাড়া ইসলামে আরো দু'টি খাত রয়েছে—যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজনদের সাহায্য-সহায়তা করা এবং তাদের নিকট ধন-সম্পদ পৌঁছে দেয়া। এ দু'টি হলো 'নাফাকাত' (ভরণ-পোষণ), অপরটি হলো 'ওয়ারাছাত' (উত্তরাধিকার সূত্র)।

পাঁচ ঃ নাফাকাত বা ভরণ-পোষণ

বিশেষ শ্রেণীর আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ইসলাম সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের উপর ন্যস্ত করেছে। এদের মধ্যে আবার এমন কতক

www.pathagar.com

রয়েছে যারা সচ্ছল অবস্থায় জীবন যাপন করুক কি অসচ্ছল অবস্থায় যিন্দেগী কাটিয়ে দিক, সব অবস্থায়ই তাদের ভরণ-পোষণ করতে হয়। যেমন স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানাদি। এদের মধ্যে আরেক দল এমন রয়েছে, যাদের ভরণ-পোষণ চালানো সঙ্গতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ ধরনের আত্মীয়-স্বজনদের একটি বিরাট তালিকা ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্রে রয়েছে। এর ফলে নিজের বংশের দুর্বল, অকর্মন্য, অর্বাচীন সদস্যদের আর্থিক সমস্যা সমাধানের একটি সুসংহত পদ্ধতির জন্ম হয়েছে।

ছয় ঃ ওয়ারাছাত বা উত্তরাধিকার সূত্র

ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তরাধিকার পদ্ধতি সম্পদ বন্টন ব্যবস্থায় একটি স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছে। উত্তরাধিকার বন্টনের অস্তিত্বহীনতার দরুন অর্থ বা ধন-সম্পদ বন্টন ব্যবস্থায় সত্যিই ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। এটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেক বিজ্ঞ, মহাজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় বিরাজমান বৈষম্যের অন্যতম ও বাস্তব কারণ এটিই।

ইউরোপে প্রধানত বংশের বড় সন্তানেরই উত্তরাধিকার মিলে। তাকেই স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এতে করে বড় সন্তানটি একাই পিতা-মাতার ত্যাজ্য সম্পতির উত্তরাধিকার হয়। পিতার আর সব সন্তানরা হয় বঞ্চিত। ক্রমে ক্রমে এই বঞ্চিতেরাই পথের ভিখারীতে রূপান্তরিত হয়। আবার অনেক সময় ইচ্ছা করলে কোন ব্যক্তি জীবিতকালে তার সমস্ত সম্পত্তি অন্যের নামেও উইল করে যেতে পারে। এতে তার নিজের সন্তানরা হয় বঞ্চিত। এ থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় সন্তানকে নিজের সমস্ত বিষয়-আশয় হতে বঞ্চিত করারও অধিকার আছে। পরিণাম ফল এ দাঁড়ায় যে, সম্পদ সম্প্রসারণের পরিবর্তে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অপর দিকে হিন্দু ধর্মের দিকে তাকালে আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। সেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে ছেলেদেরকে সামান্য সমানাধিকার দেয়া হলেও মেয়েদেরকে একেবারে বঞ্চিতা করে রাখা হয়েছে। এটা যুলুম ছাড়া আর কি হতে পারে ? তা ছাড়া সম্পদ আবর্তনের এলাকা ইসলামের তুলনায় সেখানে অনেক সংকীর্ণ হয়ে যায়।

এবার আমরা ইসলামী উত্তরাধিকার ব্যবস্থা আলোচনা করছি। ইসলাম উত্তরাধিকার বন্টনের যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে, তাতে উক্ত সমগ্র ভুল-ভ্রান্তির দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। এ ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট নিম্নে প্রদত্ত হলো।

www.pathagar.com

ক. ইসলামে আত্মীয়তার নৈকট্যানুসারে উত্তরাধিকারীদের একটি লম্বা তালিকা দেয়া হয়েছে, যার ফলে মরণের কোলে ঢলে পড়া ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি অত্যধিক বিস্তৃত পরিধিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এখানে একটি স্মরণীয় কথা এই যে, সম্পদের বেশী পরিমাণ বিস্তৃতির আশায় সমস্ত ত্যাজ্য সম্পত্তি ভূখা-নাঙ্গাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার বা জাতীয় ধনাগারে জমা করে রাখার নির্দেশ দেয়া হলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের নিকটবর্তী আত্মীয়দের বঞ্চিত হয়ে পড়ার ভয়ে নিজেদের জীবদ্দশায়ই সমগ্র ধন-সম্পদ ব্যয় করে যেতো বা ব্যয় করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতো। কারণ মানুষ আপন পরিবার-পরিজনদের ভবিষ্যত চিন্তায়ই ধন-দৌলত সঞ্চয় করে থাকে। এমতাবস্থায় মানুষের জীবন ব্যবস্থায় একটি মারাত্মক ধ্বংসকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। এ জন্যেই ইসলাম মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করে দেয়ার সুব্যবস্থা রেখেছে। এটা কিন্তু একজন ধনবান ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তিও বটে।

খ. পৃথিবীর কোন জাতিই নারীকে উত্তরাধিকার সূত্রে ধন-সম্পদ বন্টন করেনি, বরং তাকে আদিকাল হতেই বঞ্চিতা করে রেখেছে তার পিতা-মাতার সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার হতে। ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকার রূপে গণ্য করেছে এবং তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوٰلِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ـ

"মাতা-পিতা ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন যা কিছু ত্যাগ করে গেছে তার মধ্যে পুরুষদের অংশ রয়েছে। আর নারীদেরও অংশ রয়েছে তাতে, যা তার মা-বাপ ও নিকটতম আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছে। কম হোক বেশী হোক সব অবস্থায়ই তাদের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।"–(সূরা নিসা ঃ ৭)

গ. ইসলাম কাউকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার বা তার নির্ধারিত অংশে এতোটুকুও পরিবর্তন করার অধিকার দেয়নি। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এমনিভাবে ইসলাম চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

তোমাদের বাপ ও সন্তানের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে বেশী ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী তা তোমরা জানো না। এ হলো আল্লাহর ফরয বা নির্ধারিত বিধান।

www.pathagar.com

ঘ. ইসলাম ছোট-বড় সন্তানের তারতম্য করেনি, সবাইকে সমান অংশ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

ঙ. প্রাপ্য অংশ ছাড়া কোন উত্তরাধিকারীর জন্যে কোন রকমের ওয়াছিয়াত বা উইল করে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে নাজায়েয। ইসলাম ইহা সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দিয়েছে। তাই উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তার জন্য নির্ধারিত অংশ ছাড়া বেশী কিছুই পেতে পারে না।

চ. উত্তরাধিকারী ছাড়া অন্যদের জন্য মৃত ব্যক্তির ওয়াছিয়াত বা উইল করে যাওয়ার বিধি ইসলামে আছে। এতে সম্পদ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অনেকটা সাহায্য হয়ে থাকে। কেননা, উত্তরাধিকার বিলি-ব্যবস্থার আগেই সম্পদের একটা অংশ ওয়াছিয়াত হিসেবে বন্টন হয়ে যায়।

ছ. যে ব্যক্তি ওয়াছিয়াত করবে, তাকে সবটা মাল অপরকে দেয়ার জন্য ওয়াছিয়াত করার বল্গাহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। সে তার স্বীয় সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ ওয়াছিয়াত করে যেতে পারে, এর বেশী নয়। এমনি করেই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে যাওয়ার সব দুয়ার রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। সব সম্পদ অপরের নামে ওয়াছিয়াত করারও সম্ভাবনা যেখানে ছিলো, সেখানে ইসলাম এ সম্ভাবনার মূলে আঘাত হেনেছে। এমনিভাবেই ইসলাম আত্মীয়-স্বজনকে অধিকারের নিরাপত্তা দিয়েছে।

সাত ঃ খিরাজ ও জিযিয়া

উপরোক্ত খাতসমূহ ব্যতীত আরো দু'টি ব্যয়ের খাত আছে। তাহলো, সম্পদের মালিকদেরকে তাদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ সমসাময়িক সরকারের নিকট পৌছে দেয়া ফরয করে দেয়া হয়েছে। এর একটির নাম খিরাজ আর অপরটির নাম জিযিয়া। খিরাজ এক প্রকার ভূমি রাজস্ব, যা শুধু ঐসব জমিতেই আরোপিত হয়, যেসব জমি শরীয়ত অনুযায়ী 'খিরাজী' —বিজিত অমুসলিমদের সম্পত্তি যা খলিফার অনুমতিক্রমে তাদের দখলেই রয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী যিম্মীদের মালিকানাধীন ভূমিকে ইসলামের ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় 'খিরাজী' বলে।

কিতাবুল খারাজ

ভূমি রাজস্ব জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সরকার ব্যয় করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের জান-মাল, মান-সম্মান রক্ষার দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হয় বলে যে কর দিতে হয় তাকে 'জিযিয়া' বলে।

www.pathagar.com

সম্পদ বন্টনের অপ্রধান খাতসমূহ এতোক্ষণ আলোচিত হলো। ইসলাম প্রাথমিক পর্যায়ের মালিকদের ওপর এসব খাতে তাদের সম্পদ ব্যয় করা ফরয করেছে। এসব ছাড়াও গরীব, ফকীর, মিসকীন, দুঃস্থ মানুষ ও জাতীয় স্বার্থকে রক্ষার জন্যেও সম্পদ বন্টনের দিকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط (البقرة : ٢١٩)

"লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে তারা কি ব্যয় করবে ? তুমি ওদের বলে দাও, প্রয়োজনের বেশী যা আছে সবকিছু বিলিয়ে দাও।"

উপরোক্ত আয়াতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দনীয় তাঁরাই, যারা তাঁদের সম্পদের নির্ধারিত অংশ ব্যয় করে শুধু তাই নয়, তাঁদের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর গরীব বান্দাকে বিলিয়ে দেয়। এটা তাঁরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই করে, কারো চাপে পড়ে নয়।

আল্লাহর রাস্তায় খরচের নির্দেশাবলী ও তার ফযীলতসমূহের বর্ণনা কুরআন মজীদ ও হাদীসে-নববীতে বিস্তারিতভাবে রয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ

ইসলাম সমাজের দুর্বল ও দুঃস্থদেরকে পুঁজিপতিদের সম্পদের অধিকার করে দিয়েছে। এতে অনেকে হয়তো মনে করতে পারে যে, সমাজের একটি স্তর বুঝি সম্পূর্ণ অর্বাচীন হয়ে জাতির কাছে বাড়তি বোঝা হয়ে গেলো। কিন্তু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতির নাম। সে এদিকেও গভীর দৃষ্টি দিয়েছে এবং এর প্রতিকারের জন্যে বিশেষ আইনও প্রণয়ন করেছে। তাহলো ঃ

১. ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্যবান ও সক্ষম ব্যক্তি বিশেষ কয়েকটি অবস্থা ব্যতিরেকে ভিক্ষা করার অনুমতি পায়নি। কুরআন হাকীমে মিসকীনদের উদ্যমশীল ও প্রশংসনীয় গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলো ঃ

"এরা নাছোড় বান্দা হয়ে কারো কাছে ভিক্ষা মাগে না।"

২. যার কাছে একদিনের জীবিকা নির্বাহের পন্থা ও উপায় রয়েছে, তার জন্যে ভিক্ষা করা হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৩. ভিক্ষাবৃত্তিকে হাদীসে অপমানজনক কর্ম বলে নিন্দা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪. যার কাছে নেছাব পরিমাণ মাল আছে, তার জন্যে ভিক্ষা করা ছাড়াও সাদকা-খয়রাত গ্রহণ করা হারাম।

৫. গরীব মিসকীনদেরকে কষ্ট করে, মজুরী খেটে, নিজ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহের জন্যে তাগিদ দেয়া হয়েছে। নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহকে সম্মানজনক মনে করতে ও সাদকা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

৬. ইসলাম ধনীদেরকে বলেছে যে, সাদকার মাল কেবলমাত্র পকেট থেকে বের করে নিলেই চলবে না, বরং গরীব ফকীরদের অনুসন্ধান করে তা পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তাদেরই বহন করতে হবে।

৭. শাসন বিভাগের মাধ্যমেও ইসলাম ভিক্ষা বৃত্তি উচ্ছেদের বন্দোবস্ত করেছে।

উপরের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী ইসলাম একটা সুষ্ঠু, সঠিক, সুন্দর ও নিখুঁত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলো। যার ফলে ইসলামের ইতিহাসের পাতায় আমরা এমন দৃষ্টান্তও দেখতে পাই যে, সাদকা গ্রহণকারী কাউকে হাজারো খোঁজ করেও পাওয়া যেতো না।

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টন পদ্ধতির এগুলো হলো কতিপয় উজ্জল, সুস্পষ্ট ও প্রদীপ্ত রূপরেখা। যদিও এ নিবন্ধে আরো কিছু আলোচনার ইচ্ছে ছিলো। তবে এ নিবন্ধে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হতে ইসলামী অর্থনীতির স্বাতন্ত্র ও বুনিয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি ভাস্করের মত দীপ্ত হয়ে ওঠেছে বলেই আশা করি।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

প্রধান কার্যালয় ঃ	বিক্রয় কেন্দ্র ঃ	
আধুনিক প্রকাশনী ২৫, শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০ ফোন ঃ ২৩৫১৯১	❑ ৪৩৫/২–এ, বড় মগবাজার, ওয়ারলেস রেল গেট, ঢাকা–1217 ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২ ❑ ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।	❑ ৪৩ দেওয়ানজী পুকুর লেন দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম। ❑ ৫৫ খানজাহান আলী রোড, তারের পুকুর, খুলনা।